# সাইফুল ওয়াদুদ হেলালের 'বিশ্বাসের রঙ' টরন্টোতে

## সৈয়দ ইকবাল

গত বছর মন্ট্রিয়ল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শনের জন্যে মনোনীত হয়েছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ সময়ে এ রকম হয়নি। বাংলাদেশে মূলধারার সিনেমা জগতে এক নতুন ধারা নিয়ে 'সূর্য দীঘল বাড়ি' প্রথম চলচ্চিত্র যা দেশে-বিদেশে সম্মান নিয়ে আসে। তারপর ফিল্ম সোসাইটির আন্দোলনের যোদ্ধাদের মধ্যে থেকে বেশ কিছু কৃতি পরিচালক বেরিয়ে আসেন। যেমন- তানভীর মোকাম্মেল, তারেক মাসুদ, মানজারে হাসিন প্রমুখ। বিনোদন ছবির মধ্যেও নতুন মাত্রা যোগ করে এগিয়ে আসেন সালাউদ্দীন লাভলু, তৌকীর আহমেদ ও অন্যান্য। নেয়ামত হোসেন ও মসিউদ্দিন জাকেরের 'সূর্য দীঘল বাড়ি'র পর তারেক মাসুদের 'মাটির ময়না' দেশে এবং বিদেশে বহুল আলোচিত ও প্রসংশিত হয়েছে। তবে সবকিছুই দেশে থেকে করা দেশের মূলস্রোতের অনেক সুযোগ-সুবিধা পেয়ে করা। যদিও দেশেও অন্য মাত্রার জীবন যেখানে প্রতিফলিত হয় এমন চলচ্চিত্র করা খুবই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে আর্থিক ও কলা-কুশলী, টেকনিক্যাল সরঞ্জামের সাহায্য তবু দেশে মেলে, প্রবাসে যা অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভব কে যিনি প্রথম সম্ভব করেছেন তার নাম সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল উচ্চারণ করে একবার ব্রেভো বলা উচিত।
প্রবাসে করা অনেক ছবি আমি দেখেছি যা শিশুসুলভ মাত্রাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। আসলে শিশুদের ছোট করা উচিত নয় তারাও অনেক ভাবে কাজ করে ফেলে মাঝে মাঝে, যা প্রবাসী আগডুম-বাগডুম সিনেমা যে কারের চেয়ে ভালো।
হেলাল যে তাদের চেয়ে আলাদা, নিজের মন প্রাণ দিয়ে প্রবাসে থেকেও যে তানভীর মোক্কামেল, তারেক মাসুদের উমরসূরী হওয়া যায় তা প্রমাণ করেছেন হেলাল। প্রমাণ হচ্ছে- এই প্রথম প্রবাসে বানানো কোন প্রবাসী ফিল্ম মেকারের কাজ 'মন্ট্রিয়ল ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেষ্টিভাল' মনোনীত হয়। আমি দেখেছি, তানভির মোক্কামেলের ফিল্ম সোসাইটির উমাল জোয়ারে নয়াটলা মুহাম্মদ খসরুর বাসায় আসা বিশ্ববিখ্যাত সিনেমার প্রদশর্নীর আয়োজন করা। এই সব সিনেমার হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা তার অভিজ্ঞতাই তানভিরকে গড়ে তুলেছে বাংলাদেশে একজন তরুণ ফিল্মমেকার হিসেবে। তারেক মাসুদকে দেখে আসছি আদম-সুরতেরও আগে থেকে, প্রেমের টানে ভারতের লৌখ্নো যাওয়া, সম্পর্ক বিচ্ছেদে দিশেহারা দশায় আদমসুরতও থেমে যাওয়া। সবকিছু কাটিয়ে ক্যাথারিন সঙ্গী হওয়া প্রবলভাবে ফিরে আসা। সালাউদ্দিন লাভলুর প্রথম সন্তান সুখকে বাঁচাতে না পেরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ, ঢাকা ফেরে গ্রামে চলে যাওয়া। ঢাকায় আর না ফেরার শপথ। শুধু ফেরা নয় টিভি ও সিনেমায় উজ্জ্বল আলোর মত ফেরা। এসব সম্ভব হয়েছে এরা সবাই দেশে মাটিতে ছিলেন বলে। প্রবাসের কঠিন বাস্তবতার যুদ্ধে ফেরা প্রায় অসম্ভব। আর এই হার না মানার শক্তি হেলাল পেয়েছে তার স্ত্রী মীরার কাছ থেকে, হাজারো ঝড়-ঝাপটার মধ্যে কাজী মীরা আগলে রেখেছে হেলালকে সহযোগিতা করে গেছে যাতে হেলালের কাজ বন্ধ না হয়।

১৯৯৪ সালে ইমিগ্রেশন নিয়ে স্বপরিবারে মন্ট্রিয়লে আসি। আমার কৌশোর কালের বন্ধু সাংবাদিক কাজী রফিকের ছোট বোন মীরা মন্ট্রিয়লে থাকে, দেখা তো হবেই। মীরার স্বামী হেলালকে তখনই দেখি। কবি-লেখক মামুনুর রশীদকে ঘিরে একদল তারুণ্য হৈ হৈ রৈ রৈ করে 'বাংলাবার্তা' বের করছে। অনেকের মধ্যে বিশেষ করে দু'জন তরুণ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে হেলাল সেটায়ার ধর্মী লেখা পড়ে আমি তো অবাক কি চম"কার হিউমার সেন্স, কি সুন্দর দেখার চোখ। অন্যজন তুহীন নামে আজকের নামী ডিজিটাল আর্টের শিল্পী রবি খান।
হেলালের লেখা, বর্ণনা এমনকি কথা বলা সব কিছুতেই এক গতিময়তা ছিলো, ঠিক যে গতি চলচ্চিত্রে লাগে প্রদর্শণের জন্যে। মন্ট্রিয়লে একটি বছর থেকে দেশে ি

ফরে যাই। মন্টিয়লের সময়ের অনেক স্মৃতি নিয়ে টুকটাক লিখি। তার মধ্যে আমার অতি সাধারণ একটি বড় গল্প 'মনে রেখো মন্টিয়ল' হেলাল নিজেই চিত্রনাট্য

খাড়া করে ১৯৯৭ সালে হাজারো বাঁধা মধ্যে তৈরী করে ফেলে 'কবি' নামে এক ঘন্টার ছবি। ১৯৯৭ সালে অভিনয় শিল্পী শুধু নয় সরঞ্জাম ও কলাকুশলীর ভীষণ অভাব ছিল। সম্ভবত সেটাই কানাডায় করা প্রথম এক ঘন্টা বাংলা ছবি। আমি তখন একা ফিরে গিয়েছি, ইচ্ছা জাগছিলো কিভাবে 'কবি' দেখা যায়। ইচ্ছা পূরণ হতে দেরী হয়নি, ঢাকার জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে হলো জমজমাট প্রিমিয়াম শো। হল ভর্তি দর্শক বসার ঠাঁই নেই।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এলেন অনন্যা সম্পাদিকা তাসমিমা হোসেন আর প্রধান অতিথি শিল্পী মুস্তফা মোনোয়ার। মুস্তফা মনোয়ার এমন একজন প্রতিভাবান লোক যে তিনি শুরুতেই বুঝে যান কে কতদূর যাবে। হেলালের পিঠ চাপড়ে বলে দিলেন, মেকিং-এ দ্বরিদ্রতা থাকতে পারে তবে ছবিটি দেখলে বোঝা যায় সাইদুল ওয়াদুদ হেলাল থেমে যাওয়ার ছেলে নয়, এগিয়ে যাবে অনেকদূর।

মুস্তফা মনোয়ার মিথ্যে বলেননি তার প্রমাণ হেলাল বারবার দিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যে করলেন একঘন্টার আগের চেয়ে অনেক ট্যাকনিকাল ব্যালেন্স ফিচার ছবি 'গুড মনিং মন্টিয়ল'। আমার পরিচিত তৃতীয়জন যিনি গৌতম ঘোষ ও সালাউদ্দিন লাভলুর মত পরিচালক ও ক্যামেরাম্যান, পরিচালক হিসেবে অধিক গুরুত্ব পেয়ে বেশীরভাগ সময় ক্যামেরাম্যান হেলাল আড়ালে পড়ে যায়। আসলে তার কৃতি ক্যামেরার কাজ 'গুড মনিং মন্টিয়ল' ভালোভাবে দর্শকরা বুঝতে পারেন। বিশেষ করে শেষ রাতে সুনসান মন্টিয়ল শহরে একজন লোনলি বাঙালি নাবিক জাহাজ ছেড়ে একরাতের জন্যে ঘুরে দেখছে শহর। ভোরের আলো ফুটতেই তাকে ফিরতে হবে জাহাজে, ভেসে পড়বে আবার। সে মুখোমুখি হয় বিশাল গাছের নীচে আকাশে পূর্ণ চাঁদ নিয়ে এক নি"সঙ্গ স্প্যানিস তরুণ গায়ক গিটার বাজিয়ে অপূর্ব সুরে গান গেয়ে যাচ্ছে। গানতো নয় যেন নিজের করুন কণ্ঠ দিয়ে টুকরো টুকরো করছে শেষ রাতকে। এই অপূর্ব মায়াজাল দৃশ্যাবলী একমাত্র হেলালের ক্যামেরা চালনার ধ্যানধারণারই ফসল।
আমি ১৯৮২ সালে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উ"সবে গৌতম ঘোষের সঙ্গে পরিচিত হই। তার প্রথম ছবি 'দহন' ছিল উৎসবে অপর্ণা সেনের প্রথম ছবি 'চৌরঙ্গী লেনের' সঙ্গে। মমতা শংকর অভিনিত 'দহন' দেখে গৌতমকে বলেছিল, ফিচার হয়েও কেমন যেন ডকুমেন্টারী ছবি গন্ধ রয়েছে বাঙালি জিপসীদের জীবন নিয়ে করার ছবিতে। গৌতম হেসে বলেছিল, আসলে আমি তো ডকো-ফিল্ম মেকার হয়তো তাই। এরপর বিসমিল্লাহ খাঁ জীবনী নিয়ে আরো অনেক ডকুমেন্টারী ফিল্ম দেখেছি গৌতমের যা এক অপূর্ব সৃষ্টি। কেন যেন হেলালকে আমার মনে হতো একই ঘরাণার চলচ্চিত্রকার। হেলালকে যতবার বলেছি ডকুমেন্টারী ফিল্মে কাজ শুরু করতে তিনি এই বলেছে ফিচারের জন্যে স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে। যদিও হেলালের শুরুই মন্ট্রিয়ল প্রবাসী একজন সুরকারের করুন মৃত্যুর আগে করা ডকুমেন্টারী ছবি দিয়ে।
সব সময় যে ব্যাটে আর বলে সংযোগ হবে না তাতো হয় না। এবার সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল ঢাকা গিয়েছিলেন অন্যকোন ফিল্ম করার মাথায় চিন্তা নিয়ে অথচ হয়ে গেলো ইতিহাস গড়ার ডকুমেন্টারী ফিল্ম 'কালার অফ ফেইথ'। কিভাবে হলো জিজ্ঞেস করি হেলালকে।

হেলাল : আসলে সত্যিকথা হচ্ছে আমি বাংলাদেশে গিয়েছি অন্য ছবি করতে বিশ্বাসের রঙ এর কোন বিষয় মাথায় ছিলো না।
প্রশ্ন : তাহলে কিভাবে এলো?
হেলাল : আসলে আমার জন্ম বেড়ে ওঠা সবই ঢাকা শহরে। আমি গ্রামের মেলা, গ্রামীণ উ"সব তেমন একটা দেখিনি। তবে দেখার জানার ইচ্ছা প্রবল ছিল। বিশেষ করে সতেরো বছর এই কানাডায় প্রবাস আরো তীব্র করেছে বাসনাকে। ঢাকায় আমার ছোট্ট টিম প্লান অনুযায়ী ক্যামেরা নিয়ে বের হচ্ছিল অন্য লোকেশনের দিকে। তখনি একজন খবর দিলেন 'ন্যাংটা বাবা'র মাজারে উৎসব শুরু হচ্ছে আর সকাল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চিন্তা খেলে গেলো এ সুযোগ ছাড়া যাবে না। অন্তত একবার গিয়ে দেখি আমার ভালো লাগে কিনা! ঢাকা থেকে দাউদকান্দি ফেরী ঘাট, সেখান থেকে বিশ মিনিট ইঞ্জিন চালিত নৌকায় ন্যাংটা বাবার মাজার। গিয়ে তো মুগ্ধ! শয়ে শয়ে বাবার গুণমুগ্ধ মানুষ ছুটে আসছে চতুদিক থেকে। তাদের মধ্যে আধ্যাতিকতাবাদে জীবন উৎসর্গ করা অলিক বাবারাও আছে আবার সংসারী মানুষও যেমন কেউ ওরসের জন্যে মানত করা খাসি দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলছে তো সাধারণ কৃষকের বউ ঘরের মুরগীর চারটি ডিম আঁচলে ঢেকে নিয়ে চলেছেন। সবাই গিয়ে মিলেমিশে জপবেন বাবার নাম, রাত বাড়বে মগ্ন হতে-হতে একটা সময় হাজারো মানুষ এক হয়ে যাবেন বাবার প্রেমান্ধ আশিক। ওখানে ধর্ম বড় নয়। সবধর্মই বলেছে প্রেমেই মেলে সব। হিংসায় নয়।
প্রশ্ন : তারপর কি আপনার পরিকল্পনা পাল্টে কাজ শুরু করলেন।
হেলাল : আমরা তৈরী ছিলাম, সুযোগও পেলাম এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায়ও ছিলো না। এত সুন্দর একটা বিষয়। বাইরে আজকাল বাংলাদেশকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। বাংলার মানুষ মিলেমিশে রঙ্গীন মেলার ওরসে কি রকম মেতে ওঠে। একই অকুরে নারী-পুরুষ স্থান করছে অথচ কারো দৃষ্টিতে কোন কর্মে গন্ধ নেই বাই যেন এক অদৃশ্য সূতায় বাঁধা, সুতো নাড়ছেন অদৃশ্য কেউ। লাল রঙের বিশাল পতাকা উড়ছে বাতাসে, ঢোলের শব্দে কাঁপছে প্রত্যেকের মন। আমি আসলে ঢাকা শহরে বৈশাখী মেলা ও বইমেলা। ছাড়া কিছু দেখিনি তাই আমার অনুভূতি বুঝতেই পারছেন!
প্রশ্ন :আসলে ব্যাপারটি ভারতের যেকোন মন্দিরের ঐতিহ্যময় মেলার সঙ্গে মেলা পারেন।

হেলাল : ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানতো ছিলো একই গাছের দু'টি ফুলে মত। ফুল কে ফুলকে কাঁমড়ায়, তারাতো পারস্পরিক সৌরভ বিনিময় করে। অথচ ব্রিটিশরাজ শেষ করে যেতে যেতে বিষ ঢেলে দিয়ে গেলে ধর্মে ছুরী দিয়ে টুকরো করালো পাকিস্তান, হিন্দুস্থান।

প্রশ্ন : ধর্মের ছুরীদিয়ে ভাগ হওয়ার পরে খেসারত দুই পক্ষের মানুষ দিয়েছে তা ভোলার নয়। তবু ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এসেছিল। সাম্প্রতিক এই ধর্মীয় জঙ্গীবাদে উত্থানের ব্যাপারে আপনার কি মনে হয়।

হেলাল : আপনি যদি বাংলার গ্রামে ঘোরেন তাহলে বুঝবেন। সাধারণ মানুষ কি সরল তারা নিজ নিজ ধর্ম উৎসব মেলা মেনে নিজের মত মিলেমিশে থাকতে চায়। বাইরে থেকে বিষ ঢোকানো হয়েছে সুনাম নষ্ট করছে। আসলে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরই ধর্ম রাজনীতির বিষ দাঁড় ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন ছিলো, যা হয়নি। আজ তাই খেসারত দিতে হচ্ছে।

প্রশ্ন : একজন প্রবাসী বাঙালি হিসেবে আপনার মন্ট্রিয়ল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনিত হওয়ার পর কেমন লাগলো?

হেলাল : আমার কনফিডেন্স ছিলো, তড়িঘড়ি করে ইংরেজী সাবটাইটেল ইমপোজ করে ডেডলাইনের কোন প্রকারে শেষদিন জমা দিয়েছিলাম 'কালার অফ ফেইথ' তবে মনোনিত হবে আশা করি নি!

প্রশ্ন : মনোনিত সংবাদ পেয়ে কেমন লেগেছিল?

হেলাল : আনন্দে চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়েছে 'আমি পেরেছি, পরিশ্রম স্বার্থক হয়েছে। প্রায় মনে হতো ভারতীয় বংশভুত মীরা নায়ার, দীপা মেহতা, গুরীন্দর চাড্ডা যদি দেশের বাইরে থেকে কাজ করে স্বীকৃতি পেতে পারেন আমরা পারবো না কেন। ছোট প্রয়াস হোক, ছোট থেকেই বড় হয়।

প্রশ্ন : টরন্টো কানাডা নম্বর ওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ইউএফটি'র বেঙ্গলী ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে আপনার ছবি প্রদর্শনী সম্পর্কে বলুন।

হেলাল : প্রথমে ড. অমর মুখার্জীকে ধন্যবাদ, তারা মনোনিত করেছেন আমার 'বিশ্বের রঙ'। তাছাড়া টরন্টোর বাঙালি সম্প্রদায় আমার ছবিটি দেখুক ইচ্ছাটিও পূরণ হচ্ছে।

--------------------

হেলালের পরিচয়-এর বর্ষপূর্তি

কেউ প্রথমে পথ বানায় তারপর অনেকে সে পথে চলাচল করে। সাইফুল ওয়াদুদ হেলাল কানাডায় বাংলায় টিভি অনুষ্ঠানের এক প্রফেশনার এবং সৃজনশীল মাত্রায় আনন্দময় নতুন ধারার গোড়াপমন করেছেন। হেলালের আগে টুকটাক টিভির জন্যে হয়তো অনুষ্ঠান কানাডায় বাংলায় হয়েছে তবে তা দুর্বল শিশুসুলভ।

আজ 'পরিচয়ে' এর সঙ্গে না না চ্যানেলে আরো অনুষ্ঠান হচ্ছে তবে মিডিয়া প্রডাকশন পরিচয় সত্যি প্রবাসে বাংলার পরিচয়। আধ ঘণ্টার গতিময় জার্নে। দেখতে শুরু করলে শেষ না করে দর্শক চোখ সরাতে পারেন না।

এই গতিময়তা এসেছে হেলালে ক্যামেরার কাজে, এডিটিং, বিষয় নির্ধারণ, প্রবাসে বসবাসরত ও দেশ থেকে বেড়াতে আসা ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে কথোপথন সবই চমৎকার। চমৎকারের ওপরও চমৎকার থাকে তা হচ্ছে তারুণ্যের ঝর্নায় উচ্ছল উপস্থাপিকা আনিকা।

দীর্ঘ এত বছরের মাসে তিনটি কখনো চারটি করে অনুষ্ঠানে কখনো অনিকার উচ্ছাস, হাসি, কথা বলার ভঙ্গিতে স্পীড হারিয়েছে কেউ বলতে পারবে না। তাই আজ এটিএন বাংলার মাধ্যমে অন্টোরিও অফ এসটিভির মাধ্যমে নর্থ আমেরিকা বাংলাদেশ, অস্টেলিয়া সর্বত্র বিশ্বময় পরিচয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দারুণ জনপ্রিয় প্রবাসে বাঙালীর সবার পরিচয়।